أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/١٦)

www.motaher21.net

ﮋوَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ

তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন।

He sent down the Qur'an.(Criterion of judgement between right and wrong.)

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-১-৪

الٓمٓ

আলিফ্-লাম-মীম।

اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُؕ

আল্লাহ্ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্ত্বা, যিনি বিশ্ব –জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْإِنجِيلَ

তিনি সত্য সহকারে তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্বতন কিতাবের সমর্থক এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন ।

مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

ইতোপূর্বে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি সেই মানদন্ড নাযিল করেছেন যা হাক্ব ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়; নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফুরী করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা।

১-৪ নং আয়াতের তাফসীর:

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সূরার আয়াত সংখ্যাঃ ২০০ আয়াত।

সূরার নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা।

সূরার নামকরণঃ

এ সূরার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার আরেক নাম আয-যাহরাহ বা আলোকচ্ছটা। [মুসলিমঃ ৮০৪]

এছাড়াও এ সূরাকে সূরা তাইবাহ, আল-কানুয, আল-আমান, আল-মুজাদালাহ, আল-ইস্তেগফার, আল-মানিয়াহ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়েছে।

সূরার ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, তা পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি আলোকচ্ছটাময় সূরা আল-বাকারাহ ও

সূরা আলে-ইমরান পড়; কেননা, এ দুটি সূরা কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি ছায়া অথবা দু' বাক পাখির মত। তারা এসে এ দু' সূরা পাঠকারীদের পক্ষ নেবে।' [মুসলিমঃ ৮০৪]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন কুরআন আসবে যারা কুরআনের উপর আমল করেছে, তাদের পক্ষ হয়ে। তখন সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান থাকবে সবার অগ্রে।' [মুসলিমঃ ৮০৫]

(০৩-আলে-ইমরান) : নাযিল হওয়ার সময়-কাল : প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ' র প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়। দ্বিতীয় ভাষণটি إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ(আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ' র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়। তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ' র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকূ ' র শেষ অব্দি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয়। চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী : এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু' টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলী কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল।

বিষয়বস্তু : সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সর্তক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দ্বীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দ্বীন। এই দ্বীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তাঁর মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি

এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ/ঐতিহাসিক পটভূমি: সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছেঃ একঃ এই সত্য দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ –আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিগুলোকে অকস্মাত নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শ’ ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল। দুইঃ হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামান্যতমও সম্মান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এই আহলি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবদের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নাযির সরদার কা’ ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদিনাবাসীদের সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোন পরোয়াই তারা করেনি। শেষ যখন তাদের দুষ্কর্ম ও চুক্তি ভংগ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ ‘বনী কাইনুকা’ গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদিনার মুনাফিক মুসলমান ও হিযাজের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশংকা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হতেন। তিনঃ বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই ওহোদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিন’ শ মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সা.) সাথে যে সাত’ শো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালালো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এত বিপুল সংখ্যক

আস্তীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। চারঃ ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগীতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন!

(الٓمّٓ) আলিফ-লাম-মীম, এগুলো “হুরূফুল মুক্বাত্ব'আত” বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য বা অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলাই ভাল জানেন।

(الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ)

“চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী” এ দু’ টি বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার জন্য নির্দিষ্ট। যা কোন মাখলুকের জন্য প্রযোজ্য নয়।

এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পোঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্বেও যিনিই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন, একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরনতঃ আল্লাহ্ তা’ আলার তাওহীদের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম আদম ‘আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তার ওফাতের পর তার বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কিত এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতাসংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হওয়ার পর নুহ ‘আলাইহিস সালাম আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কিত ঐসব বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের দিকে আদম ''আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব ‘আলাইহিমুস সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। তারাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরন করেন। এরপর মুসা ও হারুন ‘আলাইহিমাস সালাম এবং তাদের বংশের রাসূলগণ আগমন করেন। তারা সবাই সে একই কালেমায়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কালেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এরপরও

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সেই একই আহবান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, আদম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক রাসূল অন্য রাসূলের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তার দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন; বরং তাদের একজন অন্যজন থেকে বহুদিন পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী রাসূলগণের কোন অবস্থা তাদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তারা পূর্বসুরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তাদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে সরলভাবে চিন্তা করে, তবে এত বিপুল সংখ্যক নবী-রাসূল বিভিন্ন সময় এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু রাসূলগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারো পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাদের দাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত। [তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইসমে আযম রয়েছে, এক.

(وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ)

দুই. সূরা আলে ইমরানের প্রথম দু' আয়াত’ । [তিরমিযী ৩৪৭৮]

সাধারণভাবে লোকেরা তাওরাত বলতে বাইবেলের ওল্‌ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) প্রথম দিকের পাঁচটি পুস্তক (old Testament books list) এবং ইঞ্জিল বলতে নিউ টেস্টামেণ্টের (নতুন নিয়ম) চারটি প্রসিদ্ধ ইঞ্জিল মনে করে থাকে (New Testament book list) । তাই এ পুস্তকগুলো সত্যিই আল্লাহর কালাম কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এই সঙ্গে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, এই পুস্তকগুলোতে যেসব কথা লেখা আছে যথার্থই কুরআন সেগুলোকে সত্য বলে কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তাওরাত বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে তাওরাত নিহিত রয়েছে এবং ইঞ্জিল নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইঞ্জিলের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে ইঞ্জিল পাওয়া যায়। আসলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর ওপর যেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোই তাওরাত। এর মধ্যে পাথরের তক্তার গায়ে খোদাই করে দশটি বিধান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। অবশিষ্ট বিধানগুলো হযরত মূসা (আঃ) লিখিয়ে তার বারোটি অনুলিপি করে বারোটি গোত্রকে দান করেছিলেন এবং একটি কপি সংরক্ষণ করার জন্য দান করেছিলেন বণী লাবীকে। এ কিতাবের নাম

ছিল তাওরাত। বাইতুল মাকদিস প্রথমবার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এটি একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। বনি লাবীকে যে কপিটি দেয়া হয়েছিল, পাথরের তক্তা সহকারে সেটি 'অঙ্গীকারের সিন্দুকে' র মধ্যে রাখা হয়েছিল। বনী ইসরাঈল সেটিকে 'তাওরীত' নামেই জানতো। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের গাফলতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ ইউসিয়ার আমলে যখন 'হাইকেলে সুলাইমানী' মেরামত করা হয়েছিল তখন ঘটনাক্রমে 'কাহেন' প্রধান (অর্থাৎ হাইকেল বা উপাসনা গৃহের গদীনশীন এবং জাতির প্রধান ধর্মীয় নেতা)। খিলকিয়াহ একস্থানে তাওরীত সুরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে গেলেন। তিনি একটি অদ্ভুত বস্তু হিসেবে এটি বাদশাহর প্রধান সেক্রেটারীকে দিলেন। সেক্রেটারী সেটিকে এমনভাবে বাদশাহর-সামনে পেশ করেন যেন ঐটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার (২-রাজাবলী, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৮-১৩ দেখুন) , Download বাইবেল app 1 । এ কারণেই বখ্তে নসর যখন জেরুসালেম জয় করে হাইকেলসহ সারা শহর ধ্বংস করে দিল তখন বনী ইসরাঈলরা তাওরাতের যে মূল কপিটিকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং যার অতি অল্প সংখ্যক অনুলিপি তাদের কাছে ছিল, সেগুলো হারিয়ে ফেললো চিরকালের জন্য। তারপর আযরা (উযাইর) কাহেনের যুগে বনী ইসরাঈলদের অবশিষ্ট লোকেরা বেবিলনের কারাগার থেকে জেরুসালেমে ফিরে এলো এবং বাইতুল মাকদিস পূনর্নির্মান করা হলো। এ সময় উযাইর নিজের জাতির আরো কয়েকজন মনীষীর সহায়তায় বনী ইসরাঈলদের পূর্ণ ইতিহাস লিখে ফেললেন। বর্তমান বাইবেলের প্রথম সতেরোটি পরিচ্ছেদ এ ইতিহাস সম্বলিত। এ ইতিহাসের চারটি অধ্যায় অর্থাৎ যাত্রা, লেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় বিবরণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। আযরা ও তার সহযোগীরা তাওরাতের যতগুলো আয়াত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এই জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণের সময়-কাল ও ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ঠিক জায়গা মতো সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই এখন মূসা আলাইহিস সালামের জীবন ইতিহাসের মধ্যে সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশের নামই তাওরাত। এগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কেবলমাত্র নিম্নোক্ত আলামতের ওপর নির্ভর করতে পারি। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার মাঝখানে যেখানে লেখক বলেন, প্রভু মূসাকে একথা বললেন অথবা মূসা বলেন, সদাপ্রভু তোমাদের প্রভু একথা বললেন, সেখান থেকে তাওরাতের একটি অংশ শুরু হচ্ছে, তারপর আবার যেখান থেকে জীবনী প্রসঙ্গ শুরু হয়ে গেছে সেখান থেকে ঐ অংশ খতম হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। মাঝখানে যেখানে যেখানে বাইবেলের লেখক ব্যাখ্যা বা টীকা আকারে কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ও বাছাই করে আসল তাওরাত থেকে আলাদা কিতাবসমূহের গভীর জ্ঞান রাখেন, তারা ঐসব অংশের কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিছুটা নির্ভুলভাবে তা অনুধাবন করতে পারেন। এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলোকেই কুরআন তাওরাত নামে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন এগুলোকেই সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনের পাশাপাশি দাঁড় করালে কোন কোন স্থানে ছোট খাটো ও খুঁটিনাটি বিধানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যও পাওয়া যাবে না। আজও একজন সচেতন পাঠক সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন যে, এ দু' টি স্রোতধারা একই উৎস থেকে উৎসারিত। অনুরূপভাবে ইঞ্জিল হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইলহামী ভাষণ ও বাণী সমষ্টি, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই-তিন বছরে নবী হিসেবে প্রচার করেন। এ পবিত্র বাণীসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হতে পারে কিছু লোক সেগুলো নোট করে নিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। যাহোক দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা কালে তাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে ঐ পুস্তিকাগুলোর রচয়িতাদের কাছে মৌখিক বাণী ও লিখিত স্মৃতিকথা আকারে হযরত ঈসার (আঃ) যেসব বাণী ও ভাষণ পৌঁছেছিল সেগুলোও বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত যেসব পুস্তককে ইঞ্জিল বলা হয় সেগুলো আসলে ইঞ্জিল নয়। বরং ইঞ্জিল হচ্ছে ঐ পুস্তকগুলোতে সংযোজিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের

বাণীসমূহ। আমাদের কাছে সেগুলো চেনার ও জীবনীকারদের নিজেদের কথা থেকে সেগুলো আলাদা করার এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই যে, যেখানে জীবনীকার বলেন, ঈসা বলেছেন অথবা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন-কেবলমাত্র এ স্থানগুলো আসল ইঞ্জিলের অংশ। কুরআন এ অংশগুলোর সমষ্টিকে ইঞ্জিল নামে অভিহিত করে এবং এরই সত্যতার ঘোষণা দেয়। এ বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে আজ যে কেউ কুরআনের পাশাপাশি রেখে এর সত্যতা বিচার করতে পারেন। তিনি উভয়ের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্যই দেখতে পাবেন। আর যে সামান্য পার্থক্য অনুভূত হবে পক্ষপাতহীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সহজেই দূর করা যাবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ তাআলা তোমার উপর সত্যের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে অবতীর্ণ করেছেন। ফেরেশতাগণ এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতাবগুলো, এ কুরআন কারীমের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা, ঐগুলোর মধ্যে নবী (সঃ)-এর আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর উপর তাওরাত এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। এ দু'টোও সে যুগীয় লোকদের জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল।

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলো প্রত্যেকের জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে। হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) এবং হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ) বর্ণনা করেন যে, এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা (আরবী) কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে (আরবী) বলেছেন। হযরত আবু সালিহ (রঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে ‘তাওরাত', কিন্তু এটা দুর্বল। কেননা, তাওরাতের বর্ণনা এর পূর্বে হয়েছে। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসকারী এবং বাতিলপন্থীদের কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। যারা মহা সম্মানিত নবী ও রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তাআলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

কাতাদা বলেন, এ দুটি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব। এতে রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণনা। যে এ দুটি থেকে হিদায়াত গ্রহণ করেছে, সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেটা অনুসারে আমল করেছে সে নিরাপত্তা পেয়েছে। আত-তাফসীরুস সহীহ সে হিসেবে এটাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ারপর এ দুটি গ্রন্থ রহিত হয়ে গেছে, তা থেকে হিদায়াত লাভের আর কোন উপায় নেই।

ওয়াসিলা ইবন আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ রামাদান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হয়েছিল, তাওরাত নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ইঞ্জীল নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের তের রাত্রি পার হওয়ার পর। আর ফুরকান নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের চব্বিশ রাত্রি পার হওয়ার পর। ” [মুসনাদে আহমাদ ৪/১০৭]

কাতাদাহ বলেন, আয়াতে ফুরকান বলে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা নাযিল করে এর মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর হালালকৃত বস্তুকে হালাল এবং হারামকৃত বস্তুকে এর মাধ্যমে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাঁর শরীআতকে প্রবর্তন করেছেন। অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কি কি জিনিস ফরয করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার স্তরের মাঝে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের অনুরূপ নয় বিধায়, স্বতন্ত্র পরিচয় দূরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, ইবাদাত একমাত্র তারই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ‘ইবাদাতের যোগ্যও নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

ইতিপূর্বে নবীদের উপর যে কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে, এই কিতাব সেগুলোর সত্যায়ন করে। অর্থাৎ, সে কিতাবগুলোতে যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ ছিল, তার সত্যায়ন করে এবং তাতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য বলে স্বীকার করে। আর এর পরিষ্কার অর্থ হল, কুরআন কারীমও সেই সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যে সত্তা পূর্বেও বহু কিতাব নাযিল করেছেন। এটা যদি কোন অন্য পক্ষ হতে আসত অথবা মানুষের চেষ্টার ফল হত, তাহলে এর এবং উক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মিল থাকার পরিবর্তে অমিলই থাকত।

অর্থাৎ, অবশ্যই তাওরাত এবং ইঞ্জীল সব সব সময়ে মানুষের হিদায়াতের উৎস ছিল। কারণ এগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল এটাই। এরপর 'তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন' বলে এ কথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের যামানা শেষ হয়ে গেছে। এখন তো কুরআন অবতীর্ণ হয়ে গেছে। আর কুরআনই হল ফুরকান এবং সত্য ও মিথ্যা জানার এটাই হল কষ্টিপাথর। এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর নিকট কেউ মুসলিম ও মু'মিন হতে পারবে না।

আল্লাহ তা ‘আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম, যা তার পূর্ববর্তী যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলোর সত্যায়নকারী। কিতাবগুলো হল- তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও অন্যান্য সহিফা। ঐ সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার জন্য, মূর্খতা থেকে

জ্ঞানের আলোর দিশা দেয়ার জন্য, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য। সুতরাং যারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই সঠিক পথ পাবে, উভয় কালে লাভবান হবে, সকল প্রকার কল্যাণ ও সওয়াব অর্জন করবে। আর যারা এগুলোর প্রতি অবিশ্বাস করবে ঈমান আনবে না এবং যারা নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ তা 'আলার দলীল প্রমাণকে মিথ্যা মনে করবে এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা একমাত্র আল্লাহ তা 'আলার জন্য সকল ইবাদত সম্পাদন না করে অন্যের জন্যও ইবাদত করবে বা অন্যকে তাঁর সাথে ইবাদতে শরীক করবে তাদের জন্যও রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ)

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই গোপন নেই" আল্লাহ তা 'আলা প্রত্যেকটি জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। আকাশ ও যমিনে যা কিছু রয়েছে তার প্রত্যেকটি জিনিস তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। বিষয়টি ছোট হোক বা বড় হোক, কম হোক বা বেশি হোক, প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক, এমনকি গহীন অন্ধকারে কালো পিপীলিকা কিভাবে চলাচল করে তাও তিনি জানেন। মায়ের গর্ভে কী রয়েছে তাও তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। মাতৃগর্ভস্ত সন্তান ভাল হবে, না মন্দ হবে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, সৌভাগ্যবান হবে, না দুর্ভাগ্যবান হবে সবই তাঁর জানা।

সুতরাং সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। অতএব যিনি সবকিছুর ধারক-বাহক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাঁকে ভয় করে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার ও অশ্লীল কাজ-কর্ম বর্জন করা উচিত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত। তিনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। আল্লাহ তা 'আলা এ আয়াতগুলোতে সে কথাই তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)

"যেদিন তারা (কবর হতে) বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? একক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।" (সূরা মু' মিন ৪০:১৬)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِیْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللهِ مِنْ شَیْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ)

"হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৮)

আল্লাহ তা 'আলা আরো বলেন:

(اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعۡلَمُ الۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفٰى)

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।" (সূরা আ 'লা ৮৭:৭)

সুতরাং আমাদের উচিত হবে তাঁকে ভয় করে সকল অন্যায় অবিচার বর্জন করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনুল কারীম সকল প্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

২. কুরআন পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকে সত্যায়ণকারী, বাতিলকারী নয়।

৩. আল্লাহ তা 'আলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু দেখেন ও জানেন।

৪. আল্লাহ তা 'আলা প্রকৃত মা 'বূদ, একমাত্র তিনিই সকল ইবাদত পাওয়ার হকদার।

৬. আল্লাহ তা 'আলা কিতাব ও রাসূল প্রেরণ করে বান্দার ওপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, অতএব অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই।